Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

যশোর-জেলার উপভাষা ও বিভাষার পারস্পরিক প্রভাব ও বিস্তার

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সেলীমা বেগম
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.5
Pages	93-110
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

যশোর-জেলার উপভাষা ও বিভাষার পারস্পরিক প্রভাব ও বিস্তার

সেলীমা বেগম

বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে বিভিন্ন-পর্যায়ে অত্যন্ত যুক্তি নিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়। যেমন বলা যায় পারস্পরিক মনের ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যে ব্যবস্থাকে মানুষ গ্রহণ করেছে, তাকেই আমরা ভাষা নামে অভিহিত করেছি। অথচ সেই ভাষা-ব্যবস্থা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে স্বেচ্ছা প্রণোদিত (Arbitrary) ভাবে। এর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও করা গেছে চমৎকার যুক্তিনিষ্ঠতায়। অর্থাৎ মানুষ তার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিকে কাজে লাগিয়েছে সুশৃঙ্খল অথচ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। প্রতীক বা সঙ্কেতমালার মাধ্যমে সেই ধ্বনির স্থায়ী রূপও দিতে পেরেছে। যার ফলে অঞ্চল দেশ কাল ভেদে পাওয়া বিভিন্ন পর্যায়ের ধ্বনিগুলির বিশ্লেষণ সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তবে ভাষা বলতে আমরা যা বুঝি বা বলে থাকি তার সংজ্ঞা আপেক্ষিক। কেননা ভাষা বলতে আমরা একদিকে যেমন ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন কাল বা সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কথ্য রূপ-কে এক-একটি গোষ্ঠীতে ফেলে ভাষা নামে অভিহিত করেছি তেমনি ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষার উপভাষাকেও সীমিত অর্থে ভাষা বলে সংজ্ঞায়িত করেছি। যেমন ইন্দো-ইরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী, সেমেটিক-হেমেটিক ভাষা-গোষ্ঠী, তিব্বতী ভাষা-গোষ্ঠীকে যেমন ভাষা বলছি তেমনি বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজিকেও ভাষা বলছি। তাহালে আমরা বলতে পারি ভাষার ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় রূপই আছে। তাই ভাষাকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ভাষা, উপভাষা, এবং বিভাষা—এই তিন নামে অভিহিত করা যায়। কারণ যে কোন ভৌগোলিক পরিবেশে সমাজবদ্ধ মানুষ দলবদ্ধ অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কতকগুলি নির্দিষ্ট ধ্বনি ব্যবহার করে পরস্পর বোধগম্য

ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে যে শব্দ বা শব্দাবলীর ব্যবহারে বাক্যগুলি তৈরী করে তাইই তাদের ভাষা এবং এভাবেই নিজেদের ভাষা-সম্প্রদায় গড়ে তোলে। তবে প্রয়োজনে তারা অন্য সম্প্রদায়ের ভাষাগুলি শিখতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক বা জাতিগত পরিচয় প্রয়োজনীয় নয়।

অবশ্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে এক বা একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকতে পারে, কখনো-কখনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বা শৈক্ষিক কারণে কিংবা অন্য কারণে পরিবেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেও একই ভাষা অন্যত্র ব্যবহৃত হতে পারে। তখন হয়তো স্থান-কাল পাত্র-পরিবেশ ভেদে ভাষার রূপান্তর ঘটতে পারে। ফলে প্রচলিত একটি মূল ভাষা নানাবিধ কারণে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বৈশিষ্ট্য বলতে আঞ্চলিক ভাব-ভঙ্গিমা, ধ্বনি-উচ্চারণ প্রবণতা, আঞ্চলিক ইডিয়ম-প্রয়োগ ইত্যাদি বোঝায়। আপাত দৃষ্টিতে বোঝা না-গেলেও সবটাই মানুষ ব্যবহার করেছে তার নিজের অজ্ঞাত সারে—অথচ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে। সে কারণে একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ভাষাভাষীদের কাছে অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা না শিখলে অবোধ্য থেকে যায়। এভাবে বলা যায়—রুশ ভাষাভাষীদের কাছে বাংলা-ভাষা অবোধ্য, আবার অগণিত বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে অজানা রয়ে গেছে আরবি ভাষায় লিখিত পবিত্র কোরান শরীফের শাব্দিক অর্থগুলো। আবার দেখা যায় একই দেশের একই ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষা বা বিভাষাগুলি অনেক সময় কিছুটা অবোধ্য থেকে যায় নানা কারণে। কখনও আঞ্চলিক শব্দের ভিন্নতার জন্য, কখনও উচ্চারণ প্রবণতার ভিন্নতার জন্য অথবা অন্যকোন ভাষার প্রভাবে আগত ভিন্নতার কারণে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী ও সিলেট জেলায় প্রচলিত উপভাষা ও বিভাষাগুলির কথা। এগুলি অন্য অঞ্চলের বা অন্য জেলার অনেক লোকের কাছেই বোধগম্য নয়। চট্টগ্রামের কথা যেমন বলা যায় এতে আরাকানী ভাষার কিছুটা প্রভাব পড়েছে, তেমনি বলা যায় অসমিয়া ও বাংলার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে সিলেটি ভাষা। এক্ষেত্রে আমরা উপভাষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ্যাডস্ট্র্যাটাম, সুপারস্ট্র্যাটাম ও সাবস্ট্র্যাটাম এর কথা স্মরণ করতে পারি। তবে যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে শিখে নেয় কেবল সেক্ষেত্রেই বোঝা সহজতর হয়ে ওঠে। এ কারণে ভাষা ও ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমারেখা দেখানো কঠিন। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে কোন দেশের ভাষা, উপভাষা এবং বিভাষাগুলির মধ্যে যেমন ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য দেখা যায় তেমনি

একটি ভাষা বা ভাষাসম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমানার সম্পর্ক থাকা না থাকা দুইই হতেপারে। আবার ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও ভাষার দিক থেকে কিছু শব্দ বা শব্দাবলী ছাড়া একই ভাষাভাষী হতে পারেন কিন্তু না হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ সেক্ষেত্রে তার পরিবেশ বা অবস্থানগত পার্থক্য তার ভাষার ভিন্নতার জন্য ক্রিয়াশীল।

একই লোকের বিভিন্ন ভাষা শেখা ও জানার পেছনে কাজ করেছে মানুষের জানার এবং জানানোর আগ্রহ। এর ফলে বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের কথা ভাষায় স্থায়ীরূপ দিতে চেষ্টা করায় প্রায় প্রত্যেকটি ভাষা দুটি রূপ ধারণ করেছে। স্থায়ী এবং অস্থায়ী। যেটি কথ্য বা মৌখিক তাকে অস্থায়ী বলতে পারি, কারণ তার স্থায়িত্ব কেবল শ্রোতার কানে। কিন্তু যখন প্রতীক বা সঙ্কেতমালার মাধ্যমে লেখ্যরূপ দেয়া হয়েছে তখন সেটি স্থায়িত্ব পেয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে শ্রোতার কান নয়, অগণিত মানুষের পাঠের মাধ্যমে বক্তার অনুপস্থিতিতেই ভাবের বিনিময় স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। যদিও ভাষাতত্ত্বে মানুষের কথ্যরূপই বিশ্লেষণের বিষয়, তবু লেখ্যরূপের মাধ্যমেই বিশ্লেষণকারীরা কথ্য রূপটি খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন। কারণ ভাষার লেখ্যরূপের কোন রূপান্তর ঘটেনা। লেখ্যরূপ আপাত মৃত হয়ে যায়, কিন্তু নিত্য প্রচলিত মৌখিকরূপ জীবন্ত, কেননা কথ্যরূপ ধীরে ধীরে প্রতিনিয়ত সকলের অলক্ষ্যে তার রূপ বদলাবার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে বলা যায় কোন অঞ্চলের ভৌত এবং সামাজিক পরিবেশ সেই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার উপর একটি অলিখিত প্রভাব ফেলে সকলের অগোচরে। তাই অঞ্চল ভেদে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা যা উপভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার মূল উপভাষার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় অনেক আঞ্চলিক ভাষার শাখা-প্রশাখা— যে-গুলোকে আমরা উপভাষার বিভাষা বলতে পারি।

ভৌত পরিবেশ বলতে বলা যায় কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ এবং তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব। অর্থাৎ তার অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু, আবহাওয়া, লোকসংখ্যা, নারী পুরুষের সংখ্যা, শিক্ষার হার, ধর্ম, জীবিকা, ইত্যাদির বিবরণ। এইসব ভৌত পরিবেশকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশ আঞ্চলিক লোকজ-ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আর একটি অঞ্চলের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের মানসিক-সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, ধর্মীয় ও শিল্পের মানদণ্ডে। জীবিকা ভাষার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ জীবিকা মানুষের সামাজিক অবস্থানের তারতম্য ঘটিয়ে থাকে। এ তারতম্য সূচিত

হয় অর্থনৈতিক সামর্থ্যের মাপকাঠিতে অথবা ঐতিহ্যগত কিম্বা শৈক্ষিক অবস্থান-ভেদে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ইত্যাদি নানা সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে এভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের তারতম্য ঘটে যায় অলক্ষ্যে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-ভ্রমণ, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে মানুষ তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে নিজস্ব আঙ্গিকে। এক্ষেত্রে সহায়তা করে বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান। পরবর্তীকালে পিজিমী-করণ ও ক্রেওলী-করণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন উপভাষার। একেই বলা যায় ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। তবে এ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হয় কেবল মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে।

মৌখিক ভাষাই মূলত উপভাষা। তাই ম্যাক্সমূলার-এর মত অনুযায়ী বলা যায় ভাষার প্রকৃতরূপ ও স্বাভাবিক রূপ পাওয়া যায় কেবলমাত্র উপভাষার মধ্যেই। কারণ একই দেশের মধ্যে অঞ্চলভেদে ভাষার যে নানা লৌকিক রূপ পাওয়া যায় সেগুলিই হচ্ছে মূল ভাষার উপভাষা তথা বিভাষা। উপভাষাগুলির মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন কারণ ও স্থানীয় নানাবিধ কারণে রূপান্তর দেখা যায়। এই রূপান্তর কিন্তু বিভিন্নভাবে পারস্পরিক প্রভাবের মাধ্যমে বিস্তার ঘটিয়ে থাকে শিষ্ট উপভাষার। উপভাষার রূপান্তর ঘটার কারণগুলি এভাবে দেখানো যায়:

১) বৃত্তের মাপকাঠিতে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের আয়ত্ব করণে পার্থক্য;
২) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর আয়ত্বকরণে পার্থক্য;
৩) নারী ও পুরুষ ভেদে শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য;
৪) ধর্মীয় কারণে শব্দের পার্থক্য;
৫) পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচলিত ভাষা/উপভাষার প্রভাব
৬) প্রভাবশালী ব্যক্তির আয়ত্বকরণের প্রভাব;
৭) বিভিন্নস্থান থেকে আগত এবং বসবাসকারীদের ব্যবহৃত ভাষার প্রভাব;
৮) জীবিকার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা;
৯) ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে নিজেদের সুবিধার্থে সৃষ্ট কৃত্রিম উপভাষা/ বিভাষা।

বলাবাহুল্য-এর সবগুলি কারণই কেবলমাত্র মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই মৌখিক বা কথ্য ভাষা যাকে উপভাষা বলছি তার প্রকৃত রূপ মূলত পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র

এবং অশিক্ষিত বল্‌ছি এই কারণে যে বিত্তশালী ও শিক্ষিত লোকেরা তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণে নিজেদের আঞ্চলিকতাকে বর্জন করে ক্রমেই এগিয়ে যায় শিষ্ট কথ্যভাষার দিকে। ফলে তাদের কথার মধ্যে বিভাষার আসল রূপ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও দেখা যায় সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে প্রচলিত দুটি কথ্য উপভাষার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি মিশ্র উপভাষা গড়ে ওঠে।

আবার ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াত সুবিধার কারণে দেখা যায় একই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের উপভাষার মধ্যে মিশ্রণ ঘটিত অভিন্নতা। ব্যবসায়ী, মাঝি, জেলেরা তাদের নিজেদের বোধগম্য কৃত্রিম উপভাষা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক যদি একত্রে একটি অঞ্চলে বসবাস করে তাহলেও দেখা যায় সহাবস্থানের কারণে প্রচলিত উপভাষার পাশাপাশি অপর একটি মিশ্র উপভাষা গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সন্দ্বীপ এলাকায় বসবাসকারী চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকার লোকের কথা। চট্টগ্রামের লোকেরা চট্টগ্রামি ভাষায় কথা বলে আর নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা সেখানে নোয়াখালী অঞ্চলের বিভাষায় কথা বললেও সন্দ্বীপে অপর একটি মিশ্র আঞ্চলিক উপভাষা গড়ে উঠেছে সন্দ্বীপী ভাষা নামে। এই সন্দ্বীপী বিভাষার সাথে একদিকে যেমন চট্টগ্রাম অপর দিকে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষার প্রচুর মিল এবং প্রভাব থাকলেও আজ সন্দ্বীপী একটি ভিন্ন উপভাষা হিসাবে পরিচিত।

সুতরাং কোন অঞ্চলের উপভাষা এবং বিভাষার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের সাথে সাথে সেই অঞ্চলের ভৌত এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা মনে রাখতে হবে। তাই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ তথা আবহাওয়া, জলবায়ু, শিক্ষার হার ও পরিবেশ, স্ত্রী-পুরুষ, তাদের ধর্মীয় ও শৈক্ষিক অবস্থান, পরিবেশ, জীবিকা এবং তার প্রকারভেদের আলোকে কোন ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ দরকার।

ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলতে কোন একটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং বাক্যেতত্ত্বের সার্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ ভাষার কথ্য ও লেখ্যরূপের অতীত রূপের বিকাশের বা পরিবর্তনের সাথে অন্তর্ভুক্ত ভাষা-সম্প্রদায়ের একটি তুলনামূলক বিচার আর তা সম্ভব বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে। ভাষার সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এভাবেই কোন ভাষার আংশিক বা পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া সম্ভব হয়। সে-ক্ষেত্রে উপভাষাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যে কোন একটি উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব তথা

স্বরধ্বনি, অর্ধস্বর ধ্বনি, দ্বিস্বর ধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনি, সংযুক্ত ব্যঞ্জন, যুগ্মীভবন, ধ্বনি দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত, ঝোঁক, শব্দের গঠন, উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, বিভিন্ন শাব্দিক অর্থের নমুনা ইত্যাদির ব্যাপক বিশ্লেষণে ঐ ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যায় একটি অঞ্চলের একটি উপভাষার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে প্রচলিত ভাষার অনেক অজানা পরিচয়, অথবা বলা যায় কোন অঞ্চলের প্রচলিত অধিকাংশ উপভাষা এবং বিভাষাগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই সেই অঞ্চলের মূল ভাষার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আবার একটি মান উপভাষার বিশ্লেষণেও মূল ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবেই, যেগুলি ঐ-অঞ্চলের প্রচলিত মূলভাষা বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা রাখে। গোষ্ঠীগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সীমিত গণ্ডির মধ্যে প্রচলিত কথ্য রূপে প্রবেশ করে সৃষ্টি করে বিভিন্ন উপভাষা এবং বিভাষাগুলিকে। ফলে একই অঞ্চলে প্রচলিত উপভ্যাষাগুলির মধ্যে বহু প্রাচীন শব্দ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া যায় পারস্পরিক প্রভাব, বিকাশ এবং বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। এভাবেই বলা যায় যশোর অঞ্চলের প্রচলিত লৌকিক উপভাষার কথ্যরূপের অনেকগুলি বিভাষা আছে যাদের পারস্পরিক সমন্বয়, প্রভাব, বিকাশ এবং বিস্তার প্রচলিত শিষ্ট যশোরী উপভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। আমরা সেগুলিকে এভাবে দেখাতে পারি:

১) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কথ্য ভাষার প্রভাব-পুষ্ট বিভাষা—যেমন শিষ্ট কথ্য 'ভাত খেলাম' কথাটি যশোরের উপভাষায় হবে 'ভাত খালাম' কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে 'ভাত খেল্যাম'।

২) পশ্চিমবঙ্গের বশির হাট এবং সাতক্ষীরার প্রভাব পুষ্ট বিভাষা—'ছেলে এখন রোজগার করতে শিখেছে' যশোরীতে হওয়া উচিত ছিল 'ছাবাল এ্যাহন আয় করতি শিয়েছে' কিন্তু শিষ্ট যশোরীতে হয়েছে 'ছেইলে একন রুজগার করতি শিইকেছে'।

৩) ঝিনেদা, কুষ্টিয়া এবং ভারতের নদীয়া জেলার প্রভাবপুষ্ট বিভাষা—'পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেল' কথাটি 'ঠ্যাং দিয়ে পাড়ায় ফেল' না হয়ে হয়েছে 'পা দিয়ে মাড়ায়ে ফেল'।

৪) একই নদীর তীরবর্তী নড়াইল, মাগুরা, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার কথ্য ভাষার প্রভাবপুষ্ট বিভাষা—'বাড়ী গিয়েছিলাম' কথাটি 'বাড়ী গিইলাম' না হয়ে হয়েছে 'বাড়ী গিছিলাম'।

৫) দেশের অন্যান্য অঞ্চল যেমন সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চল থেকে অভিবাসন (Migrate) নেয়া জনগণের প্রভাব পুষ্ট বিভাষা—'একজন মানুষের'-এই কথাটি সিলেটি প্রভাবে হয়েছে 'এ্যাকজন মানসির।' উল্লেখ্য, সিলেটিরা বলে 'এক মানুশর'। রাজশাহীর প্রভাব কোথাও কোথাও দেখা যায়—'য়্যাক ঝোন মান্‌সির' হয়েছে 'য়্যাক ঝন মানসির'। বগুড়া-'এ্যাক ঝনের' হয়েছে 'এ্যাক ঝন মানসির'। চট্টগ্রামে 'এগুয়া মানশের হয়েছে' 'একগন্য মানসির'। রংপুর-এর স্বরধ্বনির ও প্রভাব দেখা যায়। 'আমি করবো' না হয়ে হয়েছে 'আমি অরবো'।

৬) প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত অশিক্ষিতদের কথ্য ভাষা—যাবো-যাবানে, আলসে-উশগেড়ে ইত্যাদি শব্দের প্রচলন।

৭) অবাঙালিদের প্রভাব-পুষ্ট বিভাষা—রেলওয়ের আশে পাশে প্রচুর বিহারী এবং আগাখানীদের ভাষার প্রভাব—মোরা চা না পিলে মোদের শির দরদ করে। (আমরা চা না খেলে আমাদের মাথা ব্যথ্য করে)। আত্মহত্যা শব্দটি 'খুদখুশী' হিসাবে প্রচলিত। খাটুনী শব্দটির মূল পরিশ্রম, কিন্তু মেহনত বলার প্রবণতা দেখা যায়। হিন্দী আপ-এর অনুকরণে স্বামীর সাথে আপনি বলা।

৮) শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রভাব-পুষ্ট বিভাষা—সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেতনভাবে আঞ্চলিক টান পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে যার ফলে ভাষা ব্যবহারে প্রভাব পড়ে।

৯) ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা—যেমন 'মাল' বলতে জিনিসপত্র বোঝায় কিন্তু ব্যবসায়ীরা মাল অর্থে মেয়ে-মানুষ বুঝে থাকে।

উল্লিখিত বিভাষাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি ভাবে যশোর অঞ্চলে প্রচলিত মূল উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে যা শিষ্ট যশোরী উপভাষা বিশ্লেষণে সহায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যশোরে প্রচলিত উপভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যশোরের ঝিকরগাছা অঞ্চলে প্রচলিত বিভাষায়। এক্ষেত্রে 'ঝিকরগাছা'কে যশোরী উপভাষার কেন্দ্রীয় অঞ্চল বলে ধরে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে যশোরী উপভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। যশোরী উপভাষার বিশ্লেষণে যশোরের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে এর নৃতাত্ত্বিক দিকে গুরুত্ব দিয়ে বিভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যুক্তি যুক্ত।

যশোরের নৃতাত্ত্বিক, ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ-এর বিশ্লেষণ এভাবে করা যায়:

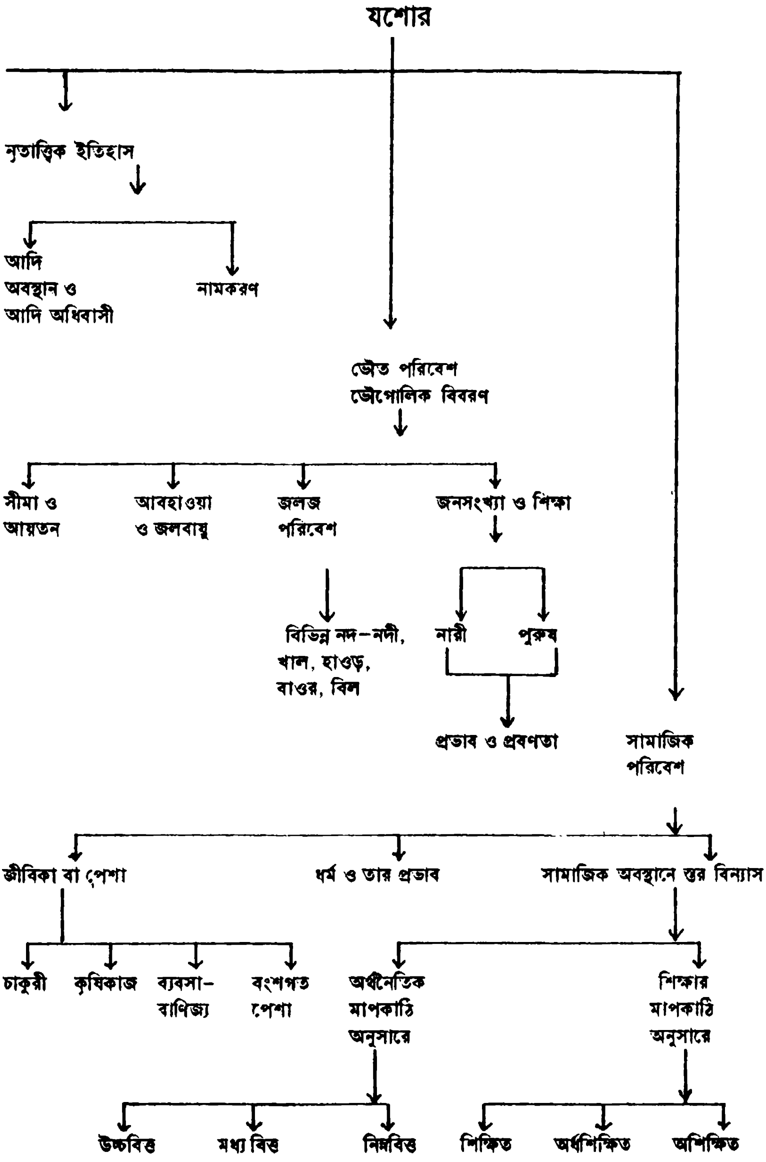

১. নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসঃ আদি অবস্থান ও অধিবাসী—যশোর জেলার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমীর মানচিত্রে দেখা যায় প্রাচীন কালে বিভিন্ন নদ-নদী খাল-বিল এই অঞ্চলটিকে দ্বীপের আকৃতি দিয়েছিল। তখন এই সমস্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক জেলে এবং মাঝিদের কথা ছাড়া অন্য কোন পেশার মানুষ বাস করত কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বদ্বীপটির দক্ষিণভাগ গঙ্গার বড়দুটি শাখা নদী ভাগীরথি ও পদ্মার স্রোতোধারায় গড়ে ওঠে নদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে বদ্বীপ আকারে। *মহাভারত* ও *পুরাণ* বলে দুটি শক্তিশালী রাজ্য সুমা রাধার তাম্রলিপ্তি পশ্চিম বাংলায় এবং পূর্ববাংলায় রাঘব শাহের আমলে ভাঙ্গা নামের রাজ্য বর্তমান ছিল। যদিও এই সব রাজত্বের সঠিক সীমানা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এটা প্রমাণিত যে পঞ্চম শতাব্দীতে রাঘব শাহের আমলের এই শক্তিশালী ভাঙ্গা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল আলোচ্য যশোর জেলা। এই সময় রাজধানীর নাম ছিল গঞ্জ। এই গঞ্জের অবস্থান ছিল তাম্রলিপ্তির দক্ষিণ পশ্চিমদিকে গঙ্গা নদীর তীরে। ধারণা করা হয় এই গঞ্জ থেকেই পরবর্তী কালে বাজার হিসাবে গঞ্জ নাম পরিচিতি লাভ করেছে। সমাচার দেব ও রাজা কীর্তিবর্মণের পর সপ্তম শতাব্দীতে গৌররাজ শশাঙ্কের অধীনে যশোর চলে আসে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যশোরের কর্তৃত্ব চলে যায় উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু-রাজা-হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) হাতে। এর পর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে যশোর দিল্লীর অধীনে চলে আসে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে রাজ্যের চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন পেশার জনপদ গড়ে ওঠে যশোর অঞ্চলে। এই সব জনপদের ব্যবহৃত ভাষাগুলির অলিখিত প্রভাব এবং সমন্বয়ে কথ্যভাষার নানাবিধ বিকাশ ঘটে।

নামকরণঃ জেনারেল কানিংহামের মতানুযায়ী যশোর বা যশোহর নামটি এসেছে আরবি শব্দ জছর (Jochor) থেকে। 'জছর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সেতু (Bridge)। বর্তমান যশোরের রাস্তাঘাট, সেতু, সাঁকো, কালভার্ট নির্মাণের পূর্বে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা। এই নৌকাগুলোকে অনেক সময় সেতুর মত ব্যবহার করা হত। জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই নৌকা ছিল, যার ফলে তাদের পেশা ছিল মাছধরা এবং নৌকা বাওয়া । এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত অন্যকোন পেশার লোকের খবর পাওয়া যায়না। নৌকা সেতু-হিসেবে কাজ করত বলে এক পর্যায়ে এই অঞ্চলকে 'জছর' বলা হত। অবশ্য এ সম্পর্কিত অনেক

উপকথাও প্রচলিত আছে। যেমন, তৎকালীন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী গৌড়ের আভিজাত্য ও যশকে হরণ করেছিল এই অঞ্চল, তাই এর নাম যশোহর অর্থাৎ যশকে হরণ করেছে যে। আবার কেউ কেউ বলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুর থেকে এই যশোর নামের উৎপত্তি। তবে যশোরের প্রাচীন ও বর্তমান মানচিত্র জেনারেল কানিংহামের মতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষেই রায় দেয়।

ভৌত-পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিবরণ: সীমা ও আয়তনের দিক থেকে বলা যায় খুলনা বিভাগের একটি জেলা বর্তমান যশোর জেলা। ২২°৪৭´ থেকে ২৩°৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮.৪০´ থেকে ৮৯° ৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। উচ্চতার দিক দিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৬ফুট উপরে। পূর্বের ১৯টি জেলার মধ্যে ছিল দ্বাদশতম। তবে নড়াইল, মাগুরা, ঝিনেদা, জেলা হবার-আগে যশোর-এর অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন এর আয়তন ছিল ২,৫৪০ বর্গমাইল। এই সমস্ত অঞ্চলের উল্লেখ এই জন্য প্রায়াজনীয় যে উপভাষা বিশ্লেষণে এই সব এলাকার সমন্বিত প্রভাব ও বিস্তারের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরই এই সমস্ত এলাকা জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যশোরের এই আঞ্চলিক পরিবর্তন ক্রমাগত ঘটে আসছে এর জন্ম লগ্ন থেকেই। তদানীন্তন বাংলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে থাকায় যশোরও চলে আসে কোম্পানীর আওতায়। মুরলীতে রাজধানী হয় প্রথমে, তারপর রাজধানী হয় কশবায়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় যশোর চলে আসে মি. রকির আমলে। ১৭৯৫ সালে মি. বন্ড কর্তৃক রূপদিয়াতে নীলকারখানা এবং নীলচাষের ব্যবসায়িক সাফল্য যশোরকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করে। এই সময় ব্যবসায়িক কারণে স্থানীয়/ অস্থানীয় এবং বিদেশী ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য কৃত্রিম উপভাষারও সৃষ্টি হয়, যার উদাহরণ দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকে পাওয়া যায়। ১৮৬০-৬১ সালে যশোর জেলা গড়ে ওঠে খুলনা, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল এবং যশোর সদর অঞ্চল নিয়ে। ১৮৬২ সালে খুলনা বেরিয়ে গেলে ১৮৮৩ সালে এই জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়ার বনগাঁ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যশোরের সীমানা পুনরায় বদলে যায়। এই সীমানা পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে যশোরের মূল উপভাষার উপর অলিখিত প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে একই উপভাষার

অন্তর্গত কয়েকটি বিভাষা পাই যা ভাষার সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু: আবহাওয়া ও জলবায়ু ভাষার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছে বিবিধ শব্দাবলী ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন 'শিশির' কথাটি 'নিয়ের' নামে পরিচিত। শীত জাড় নামে ঠাণ্ডা 'কাল' বলে পরিচিত। গরম বোঝাতে বলা হয়ে থাকে—'গরমে সেদ্দ হয়ে গেলাম' বা 'শীতে কালায় গেল হাত পা' ইত্যাদি।

জলজ পরিবেশ: বিভিন্ন নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল-নদী ভাষার উপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। ভাষা নদীর মতই বহতা। তাই বহতা এই ভাষার প্রসার ঘটে যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে। ফলে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনে উপভাষা সৃষ্টিতে নদীর ভূমিকা অন্যতম। এজন্য বৃহত্তর যশোরের নদীর ভূমিকা উত্থাপন করা যায়। এই নদীগুলির বাহিত পলিমাটি যশোরকে একদিকে বদ্বীপের আকার দিয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ও যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন এলাকার জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করেছে, অপর দিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের বোধগম্য কৃত্রিম উপভাষার জন্ম দিয়েছে। প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষাগুলির পারস্পরিক পরিচিতি নতুন বিভাষা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। যশোর-খুলনার সমভূমি দক্ষিণ দিকে নিম্নভূমি হওয়ায় বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত নদী ও খালগুলি এই সব অঞ্চল দিয়ে এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বেশীর ভাগ নদীই গঙ্গা, পদ্মা, মাথা-ভাঙ্গা এবং যমুনার শাখা-প্রশাখা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নদীগুলির বিশেষ অবদান থাকায় রাজনৈতিক সীমানা নয় নদীভিত্তিক সীমানা একটি দেশের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে যে সব নদী ও খাল-বিল যশোরের উপভাষা-বিভাষাগুলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এখানে সেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। নদ-নদীগুলির মধ্যে কুমার, ভৈরব, ভদ্রা, গড়াই, মধুমতি, নবগঙ্গা, কালিগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষ্য, বেতনা উল্লেখযোগ্য। তবে আড়িয়াল খাঁ, আত্রাই, রূপশা, পশুর ইত্যাদি নদীর কথাও বলা দরকার। এই সব নদ-নদীকে একসূত্রে গেঁথেছে বিভিন্ন এলাকার ছোট ছোট নদ-নদী সদৃশ খালগুলি। যেমন মুচিখালি, বারাসিয়া, ব্যাং, ফটকী, হরিহর ইত্যাদি। বিভিন্ন নদ-নদী ও খালগুলি বাঁক বদলাবার সময় সৃষ্টি হয়েছে হাওড় এবং বাওড়গুলি। এরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে

একদিকে যশোরকে বদ্বীপের আকার দিয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন জেলার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করেছে। সড়ক-ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হলেও সুলভ ও সহজসাধ্যের কারণে মানুষ নদী-পথকেই বেছে নিয়েছে। যার ফলে কুষ্টিয়া, ঝিনেদা, ফরিদপুর, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা-বিভাষার সাথে যশোর অঞ্চলের উপভাষা-বিভাষার এমন একটি সমন্বিত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অন্যতম গরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত।

জনসংখ্যা ও শিক্ষা: নারী-পুরুষ, তাদের স্বভাব ও প্রবণতা—১৯৬১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যশোরের লোকসংখ্যা ছিল ২১৯০১৫১ জন। প্রতিবর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৪৮ জন। ১৯৭৪ সালের গণনায় দেখা যায় এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৩২৬৭৭৪ জন। এর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ১৬১৫৫২৭ এবং ১৭১১২৫১ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গমাইলে ১২৮৭ জন। ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণে নারী-পুরুষের বাক্য ব্যবহারে শব্দব্যবহার-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের স্বভাব-প্রবণতা অনেকাংশে দায়ী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক এবং শৈক্ষিক অবস্থান। সম্বোধন, সম্ভাষণ, স্বজন-সম্বোধন, প্রত্যয়-বিভক্তি, রূপমূল ইত্যাদির ব্যবহারে অর্থনৈতিক, সামাজিক স্তর-বিন্যাস এবং টেবুর কারণে নরনারীর কথার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্যের সূচনা করে। যশোর অঞ্চলের বিভাষাগুলিও এর বাইরে নয়। পুরুষের চেয়ে নারীরা অধিক রক্ষণশীল হওয়ায় টেবুর প্রভাব তাদের উপর বেশী দেখা যায়। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর অশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে এই টেবুর কারণে বাক্যের মধ্যে অনেক শব্দ ব্যবহার না করে বিকল্প শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়, যেমন কোন লোকের নাম যদি 'কেনায়েত' হয় তাহলে তার স্ত্রী/ছোট ভাই-এর স্ত্রী অথবা পুত্রবধূ স্থানীয় নারী কোনক্রমেই 'কেনায়েত' শব্দটি উচ্চারণ করবেনা। এমনকি কেনা কাটার কথা বলতে হলে তারা কেনা শব্দটি পরিহার করে বেসাতি অথবা সওদা শব্দটি বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করবে। এই টেবুর কারণে দেখা যায় শাশুড়ী নতুন জামাই-এর সাথে আপনি, স্ত্রী স্বামীর সাথে আপনি করে কথা বলে। শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ এবং বাক্যাংশ যা কেবল স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করে। যেমন অসভ্য/যাঃ/কি মিষ্টি/ এঃ মা / ও মাগো/ ইত্যাদি। সম্বোধন-এর ক্ষেত্রে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়: একজন নারী কেবলমাত্র আর একজন নারীর সঙ্গে আলাপচারিতায় বলে থাকে: কিলো/ওলো/ ইত্যাদি। অথবা আ মইলো যা। স্বামীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে হ্যাগো/ওগো প্রবাদ প্রবচন বলার প্রবণতা—যেমন, মোটে বউ রানদে

না তার পানতা আর তপত। কথার মধ্যে অকারণে না বলার প্রবণতা: 'আমি না কাইলকে আফনার কাছে না গিইলাম কিন্তু আপনারে না পাইয়ে আমার না ম্যালা অসুবিদে হইলো। আপনারে না সব কইয়ে ফ্যাললাম কিছু মনে অরবেন না।' অর্থাৎ 'আমি না গতকাল আপনার কাছে না গিয়ে ছিলাম কিন্তু আপনাকে না পেয়ে আমার না বেশ অসুবিধা হয়েছিল আপনাকে সব বলে ফেললাম কিছু মনে করবেন না।'

পুরুষের ক্ষেত্রে টেবুর প্রবণতা কম দেখা যায়। তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিচয় দিতে গেলে সমাজের দরিদ্র এবং অশিক্ষিত স্তরের লোক 'পরিবার' বলে থাকে। স্ত্রীকে ডাক্‌তে হলে ছেলেমেয়ের মা বলে ডাকার চেয়ে 'এই যে' 'কণে গেলে' বলতে দেখা যায়। এভাবে ডাক্‌লে সমাজের সবাই বুঝতে পারবে বক্তা তার স্ত্রীকে ডাকছে। নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান তাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত ভাষা থেকে বোঝা যায়:

আলীম বিয়ে করবে এই মাসের ১৭ তারিখে।
আলীম বিয়ে অরবে এই মাসের সতের তারিকি।
সখিনার বিয়ে হবে এই মাসের ১৭ তারিখে।
সহিনার বিয়ে হবে এই মাসের সতের তারিকি।
অথবা—আলীম সহিনারে বিয়ে অরেছে
কিন্তু, সহিনার বিয়ে হয়েছে আলীমির সাতে।

এখানে যদি আলীমের মত বলা হত সখিনা বিয়ে করবে এই মাসের ১৭ তারিখে কিম্বা সখিনা বিয়ে করেছে আলীমকে তাহলে ব্যাকরণ গত ভুল না হলেও সামাজিক ভাবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা হত না, হাস্যকর শোনাত।

সামাজিক পরিবেশ: জীবিকা, ধর্ম ও তার প্রভাব—সামাজিক অবস্থানের স্তর বিন্যাস-এ দেখা যায় জীবিকা এবং ধর্ম ও তার প্রভাব সামাজিক অবস্থানের স্তর বিন্যাস ঘটায়। এ স্তর-বিন্যাস প্রধানত হয়ে থাকে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার মাপকাঠি অনুসারে। জীবিকা বা পেশা তার সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে তার অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের মাপকাঠি অনুসারে। শিক্ষা তার অভিজাত্য ও বংশগৌবের মাপকাঠি নির্ণয় করে।

ভাষার বৈচিত্র্য-বৈষম্য ও ভিন্নতার মূল পাওয়া যায় প্রধানত সামাজিক স্তর বিন্যাসে। তাই ভাষা সংগঠনের বৈচিত্র্য সমাজ সংগঠনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের মূল উৎস এখানেই। কারণ সামাজিক মন ও সমাজজীবনের গতি প্রকৃতির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ভাষার বিশ্লেষণ সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানের কাজ। ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও সামাজিক পরিবেশ যে-কোন ভাষার বিকাশে কমবেশী সহায়তা করে। ভাষা

সংগঠনে অবিমিশ্র এবং বিশুদ্ধ উপদান কেবল অজগ্রামের অশিক্ষিত কিন্তু বয়সে প্রবীণ ভাষাভাষীর কাছ থেকে পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র উপভাষা পাওয়া অবিশ্বাস্য। কেননা যে কোন সামাজিক পরিবেশের মানবগোষ্ঠী—ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলামন, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বহু-বিভক্ত। ফলে এই সব বিভিন্ন সামাজিক স্তর ভাষার মধ্যেও বিভিন্ন গঠন-বৈচিত্র্য আনে। সে কারণে বক্তার ভাববিনিময়-ব্যবস্থা স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। তখনই প্রশ্ন জাগে সমাজের একজন ব্যক্তি সর্বত্র একই ভাবে কথা বলে কিনা, নরনারীর কথার মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয় কিনা, বংশগৌরব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিমণ্ডলে কথার বৈচিত্র্য কী পরিমাণ। বিত্ত সমাজের বাক্য ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনতে পারে কিনা, কিংবা একই অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা বিভাষা প্রচলিত কিনা; উপভাষা বিভাষাগুলি বিদেশী ভাষার সংস্পর্শে এসে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে অথবা প্রভাবিত হয়। সমাজে একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব ও বৈরী উভয় পরিমণ্ডলে সর্বত্র একই ভাবে কথা বলে কিনা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় সমাজে একজন ব্যক্তির সামাজিক স্তর কোন্ পর্যায়ের তার উপর নির্ভর করে তার বাক্য-ব্যবহার-প্রক্রিয়া, তবে সাধারণত, দেখা যায় সমাজে একজন ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন ভাইবোন, বন্ধু, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ঠিক সেইভাবে কথা বলেন না। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত এগুলির পরিবর্তন হয়না। ভিন্নতা কেবল সম্বোধন এবং সর্বনাম প্রয়োগে। কোথাও কোথাও আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা হয়। আবার একজন দরিদ্র ও অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি কোন শিক্ষিত অথবা বিত্তশালী পরিবারের সংস্পর্শে আসে তাহলে দেখা যায় তার কথার মধ্যে বৈচিত্র্যের আভাষ। মূল বিভাষার মধ্যে মিশ্রণের প্রয়াস অনুকরণের অলিখিত প্রভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আঞ্চলিকতাকে পরিত্যাগের প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রবণতা তাকে শিষ্ট ভাষার দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য নিজ গ্রাম বা নিজ পরিবারের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। ধনীরা বিত্তের কারণে নিজেদেরকে মর্যাদাশীল মনে করায় আঞ্চলিক ভাষাকে পরিত্যাগ করার প্রবণতা পোষণ করে। বংশগৌরব এবং আভিজাত্যাভিমান থেকেও কথ্য বাক্য ব্যবহারে ও সংগঠনের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যের সূচনা করে বাক্য ও শব্দ চয়নের

ক্ষেত্রে। কিছু-কিছু শব্দ কোন-কোন অঞ্চলে অশ্লীল বলে প্রতীয়মান হলে ঐ-সব শব্দ সচেতনভাবে পরিহার করে অন্যভাবে বলার প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী gold এর কথা বলা যায়। এই gold এর চলিত বাংলা রূপ সোনা হলেও কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চলের বাসিন্দাকে দেখা যায় gold এর বাংলা স্বর্ণ বলতে। এভাবে যশোরের উপভাষায় 'মাগী' শব্দটিকে ধরা যায়। যার অর্থ স্ত্রীলোক। কিন্তু যশোর অঞ্চলের শিক্ষিত এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা কখনই এই 'মাগী' শব্দটিকে ব্যবহার করবেনা বাক্যের মধ্যে। এক্ষেত্রে তারা তাদের উপভাষায় মেয়েলোক/স্ত্রীলোক/মেয়েমানুষ/মহিলা ইত্যাদি বলবেন। শুধু তাই নয় 'মাগী' শব্দটিকে সমাজের কোন স্তরের লোকই মর্যাদাশীল কোন মহিলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন না। তেমনি বরিশাল অঞ্চলে 'মাতারী' শব্দের অর্থ মহিলা, কিন্তু যশোরে এই মাতারী শব্দটি ঠিকা কাজের বেটীকে বলা হয়ে থাকে—অর্থ বা বিত্তের দিক থেকে যার অবস্থান নিম্নে। এভাবে আমরা 'কাজ' এবং 'নিকে' শব্দ দুটির কথা বলতে পারি। কাজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ইংরেজী work. কিন্তু যশোর অঞ্চলে এই কাজ শব্দটির ব্যবহার করা যায় এভাবে—রহিমুদ্দী আবার কাজ করতে গেছে। এক্ষেত্রে রহিমুদ্দীন-এর বিয়ের কথা বোঝাবে। অর্থাৎ রহিমুদ্দীন পুনরায় বিয়ে করতে গেছে। কাজ শব্দের আমরা এরকম কয়েকটি ভিন্ন অর্থ করতে পারি। নিকে শব্দটি এসেছে আরবী 'নিকাহ্' থেকে, যার অর্থ বিয়ে কিন্তু যশোর অঞ্চলে এই নিকাহ্ থেকে নিকে শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহ।

ধর্মীয় কারণও সামাজিক স্তরে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে বৈষম্য আনে। একই লোকজন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েও কথোপকথনে স্বতন্ত্র ধর্মভিত্তিক শাব্দিক বৈচিত্র্য আনে। ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগের পূর্বেই যশোর জেলা হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় সমগ্র সামাজিক পরিবেশ অভিন্ন থাকলেও ভিন্নতা ছিল ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও শব্দ ব্যবহারে। যেমন—

	মুসলিম	হিন্দু
স্বজন সূচক শব্দ	বাপজান। আব্বা	বাবু, বাবা
	বু জান, বু, আপা	দিদি
	খালাজান, খালা	মাসী

	মুসলিম	হিন্দু
স্বজন সূচক শব্দ	ফুপু ননদ	- পিসী ঠাকুর ঝি ইত্যাদি।
সম্বোধন সূচক শব্দ	সাহেব, মিঞা সাব জি হ্যা	বাবু, মশায় আইজ্ঞে । হ্যা
ধর্মভিত্তিক নাম	আল্লাহ্, খোদা রহমান পানি নামাজ রোজা	ভগবান, ঈশ্বর দয়াময় জল পূজো উপোস।
উপাধি সূচক শব্দ	খোন্দকার, শেখ সৈয়দ, বেগম খাতুন	চাটুজ্যে, মুখুজ্যে দেবী, দাসী

বাক্যের পার্থক্য:

রহমত মারা গেছে। রমেন গঙ্গা পেয়েছে। তবে যশোর অঞ্চলে কিছু শব্দের সাধারণ ব্যবহার দেখা যায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন-পানি কচু, জলবসন্ত, হাড়মূলে, অলক্ষ্মী, মাদুর, ইত্যাদি।

সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ থাকে। তাদের পেশাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যশোর-এর জনসমাজ তার বাইরে নয়। এখানে বংশগত পেশা তার উপাধি এনে দেয়। যেমন, বাজনদার, কাহার, কুমার, নিকেরী, জেলে ইত্যাদি। মুসলমান মাছ ধরাওয়ালাকে নিকেরী এবং হিন্দু মাছ ধরাওয়ালাকে জেলে বলা হয়। এদের ভাষা ব্যবহারে তাদের পরিমণ্ডলীয় শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। কারণ পেশাগত বিভিন্নতা একটি ভাষার তথা উপভাষা এবং বিভাষার মধ্যেও বিভিন্নতা আনে। আর একারণেই ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। পেশার কারণেই একজন ব্যক্তির পরিবেশ-পরিমণ্ডল, বিষয়বস্তু, বক্তার বৈশিষ্ট্য বিভিন্নভাবে দেখা দেওয়ায় তার ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য দেখা

যায় তার অজ্ঞাতসারে। তাই সমাজের একজন কৃষিজীবী, কাঠমিস্ত্রী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, উকিল, অধ্যাপক, সেবিকা, শিল্পী প্রত্যেকের ভাষা-ব্যবহারে ভিন্নতা এসে যায়। অর্থাৎ একজন কাঠ-মিস্ত্রী বা চাষী তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে অথবা কর্মক্ষেত্রে যেভাবে কথা বলবে একজন ডাক্তার, সেবিকা, প্রকৌশলী, শিল্পী, উকিল, অধ্যাপক সেভাবে কথা বলেন না। তাঁদের ভাষার সাংগঠনিক ভিন্নতা তাদের ভাষাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কারণ প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল প্রত্যেকের ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনে। কখনো-কখনো দেখা যায় ব্যবসায়ী এবং নাবিকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে অন্যান্যদের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য নিজেদের বোধগম্য কৃত্রিম উপভাষার সৃষ্টি করে যার থেকে পিজিয়ন-এর উৎপত্তি। যেমন যশোর-ঝিকরগাছা অঞ্চলে একটি কথার প্রচলন আছে যা যশোরের শিষ্ট উপভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। শব্দটি হচ্ছে ব্লাক। যার শাব্দিক অর্থ ইংরেজীতে Black বা কালো, কিন্তু যশোরে এই শব্দটির অর্থ চোরাচালান। যদি বলা হয় 'করিম ব্লাক করে' তার অর্থ 'করিম চোরা কোরবারের সাথে জড়িত'।

এভাবেই দেখা যায় যশোরে প্রচলিত উপভাষা বিভাষাগুলির সঙ্গে মিলে শিষ্ট উপভাষা সৃষ্টিতে সক্রিয়।

সহায়ক-গ্রন্থ

১　*Bangladesh District Gazetteers.* Jessore 1979
২　*Bengal District Gazetteers.* Jessore. Calcutta, 1912
৩　*History of Bengal,* J.N. Sarkar.
৪　*Dynastic History of Bengal,* A. M. Chowdhury.
৫　*আধুনিক ভাষাতত্ত্ব:* আবুল কালাম মনুজর মোরশেদ.
৬　*ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব:* মুহম্মদ আবদুল হাই
৭　*ভাষার ইতিবৃত্ত:* সুকুমার সেন
৮　*ভাষাতত্ত্ব:* রফিকুল ইসলাম
৯　*ভাষা: দেশ, কাল :* পবিত্র সরকার
১০　*বাঙ্গালা ব্যাকরণ:* মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
১১　*বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস :* কৃষ্ণপদ গোস্বামী
১২　*ভাষাবিজ্ঞান পরিচয়:* সুকুমার বিশ্বাস
১৩　*ভাষা প্রকাশ-বাঙ্গালা ব্যাকরণ:* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪　(১) 'ভাষার সহাবস্থান: কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া' : রাজীব হুমায়ুন
　(২) 'নারী পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্য: সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা': রাজীব হুমায়ুন

১৫ *Sociolinguistic And Descriptive Study of Sandvipi, A Bangla Dialect:* Rajib Humayun.

১৬ হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষা,* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

১৭ *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা :* রামেশ্বর শ', কলকাতা, ১৯৮৮

১৮ *শব্দ কথা :* ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯ *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান :* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

২০ *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা :* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১ *যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষা :* এস. এম. লুৎফর রহমান

২২ *যশোর-খুলনার ছড়া :* শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

২৩ *রাজশাহীর উপভাষা :* পি.এম. সফিকুল ইসলাম

২৪ *যশোর খুলনার ইতিহাস :* সতীশচন্দ্র মিত্র